১

বাংলা

সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্যচর্চা

বহুমাত্রিক চেতনায়

সম্পাদনা

তপন মন্ডল | দীপঙ্কর মল্লিক

রাকেশ জানা | অভি কোলে

Bangla Samaj-Sanskriti-Sahityacharcha : Bahumatrik Chetanay

Vol. I

Edited by

Tapan Mandal ● Dipankar Mallik
Rakesh Jana ● Abhi Kole

Published by

Diya Publication
44/1A Beniatola Lane, Kolkata-700009
Phone : 6291811415
e-mail : diyapublication@gmail.com || diyapublication64@gmail.com
website : https://diyapublication.in/
facebook : দিয়া পাবলিকেশন কলকাতা
facebook page : https://www.facebook.com/diyapublicaton/

Collaboration with

Midnapore city college
Kuturiya, Bhadutala, Midnapore, Pachim Medinipur
&
The Gouri Cultural & Educational Association
Social Welfare Organisation & Research Institution of
Society, Culture & Education
Registration No. S/IL/34421/2005-06 ● Established : 23.9.1995

ISBN : 978-93-87003-46-0

প্রথম প্রকাশ : ২.০৬.২০২৩

শোভন সংস্করণ : মূল্য ৪৯৯/-

সূ | চি | প | ত্র

প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য ১-৮১

চর্যাপদে নারী-ভাবনা : সমকালীন সমাজে নারীর স্থান ও ভূমিকা
বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে আলোচনা
লুসী মণ্ডল
১

নন্দনতত্ত্বের আলোকে বৈষ্ণব পদাবলী
দীপঙ্কর মল্লিক
৭

সমাজ-দর্শন-ধর্ম-সংস্কৃতি এবং সাহিত্যক্ষেত্রে অদ্বিতীয় যুগনায়ক : শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
গীতিকা পণ্ডা
১৯

নবজন্মতত্ত্বে 'লোকপুরাণ' : মনসামঙ্গলকেন্দ্রিক নির্বাচিত বাংলা সাহিত্য
সৃজন দে সরকার
২৭

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' : প্রসঙ্গ শৈলীগত অনুধাবন
সন্দীপ দাস
৩১

ধর্ম সমন্বয়ের কাল ও চিহ্ন : প্রসঙ্গত দক্ষিণ রায় ও গাজি খাঁ'র আখ্যান
অরিন্দম অধিকারী
৩৮

মহুয়া গীতিকা : পাঠকের পাঠপ্রতিক্রিয়ায়
বৈশাখী পাঠক
৪৫

মৈমনসিংহ গীতিকায় উল্লিখিত মধ্যযুগের অলংকার : একটি সমাজতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ
অজয় কুমার দাস
৫০

কবিগানে বৈষ্ণব ভাবনা : একটি পর্যালোচনা
সুবীর ঘোষ
৬০

বস্তুবাদ ও দেহবাদ : প্রসঙ্গ বাউল গান
অন্তরা ব্যানার্জি
৬৮

মধ্যযুগের প্রথমার্ধে বাংলা সাহিত্যের বিকাশ
আকবর আলি শাহ
৭৩

বাংলা সাহিত্যচর্চা : বহুমাত্রিক চেতনায় অনুবাদ সাহিত্য
শিপ্রা ভট্টাচার্য
৭৮

লোকসাহিত্য ৮২-১৬০

বাঙালি-আদিবাসী সাংস্কৃতিক সম্পর্ক : একটি পর্যালোচনা
মকর মুর্মু
৮২

বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে লাঠিখেলা
দয়াল চাঁদ সরদার
৮৮

ছড়ার রূপ ও রূপান্তর
রাজু ভুঁই
৯৬

ব্রতকথা : নারী মনস্তত্ত্বের আলোকে
অর্জুন কুমার দাস
১০০

রাঢ়ের প্রবাদ দর্পণে ভাষার আনুষঙ্গিকতা
অর্পিতা চৌধুরী
১০৬

বাংলা প্রবাদ ও ট্যাবুর পরম্পরায় স্বচ্ছতা : করোনা অতিমারির অভিজ্ঞতা
পর্ণা মণ্ডল
১১৩

বিশ্বায়ন ও লোকক্রীড়া: সংকটের প্রশ্নে লোকক্রীড়া ডাংগুলি
সার্থক লাহা
১১৭

লোকসংগীত বিবর্তনের ধারাপাত ও গাজন গান : প্রেক্ষিত দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা
সুচন্দন মণ্ডল
১২২

মুর্শিদাবাদ জেলার বিলুপ্তপ্রায় লোকগীতি কাহিনিগান
টুকটুকি হালদার
১৩৩

উত্তর ২৪ পরগনার ব্রতকথা : অন্য ভাবনায়
পুষ্পেন্দু মজুমদার
১৪১

নির্বাচিত বাংলা সাহিত্যে বাঁকুড়ার লোকশিল্প
দশরথ রজক
১৪৫

বঙ্গে গাজন উৎসব
স্বপন হাজরা
১৫১

ব্রতকথা ও পাঁচালি : বাংলার সম্পদ
সুস্মিতা সাহা
১৫৭

কবিতা ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ **১৬১-২২৬**

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় অধ্যাত্মভাবনা
মন্দিরা দে
১৬১

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতায় আঙ্গিক ভাবনা
গুরুপদ অধিকারী
১৬৭

জীবনানন্দের কবিতায় আত্মসমীক্ষণ : অনন্বয় থেকে সমন্বয়ের অভিমুখে যাত্রা
সৌরভ মজুমদার
১৭৪

জীবনানন্দ দাশের কাব্যে পাশ্চাত্য পুরাণের আখ্যান
দিবাকর বর্মন
১৮২

ধর্মনিরপেক্ষ, মানবতাবাদী কবি জীবনানন্দ দাশ ও তাঁর কবিতা
কাজী সাকেরুল হক
১৮৮

'শিকার' : নাগরিক লোভ-লালসা-লোলুপতা এবং একটি মৃত্যুর কাহিনি
মৈত্রেয়ী বিশ্বাস
১৯৮

যখন আকাশে নামে নির্জন বিষাদ : বিষ্ণু দে-র কবিতা
সুরজিৎ প্রামাণিক
২০১

শামসুর রাহমানের কবিতা : প্রবহমান জীবনের মন্তাজ
সুস্মিতা সাহা
২০৭

কবি মন্দাক্রান্তা সেনের কবিতায় বিষণ্ণতাবোধ
শোভনলাল বিশ্বাস
২১১

নিশীথ ভড়-এর কবিতার বহির্মুখ ও অন্তর্মুখ
শুভম চক্রবর্তী
২১৬

'শতভিষা' : বাংলা কাব্যজগতের একটি উত্তরণ
ঋদ্ধি পান
২২২

বঙ্গো গাজন উৎসব

স্বপন হাজরা

নব্যপ্রস্তর যুগে কৃষিকাজের উদ্ভব হওয়ার পর, মূলত কৃষিকাজের উপর নির্ভর করেই মানুষ সভ্যতার এক এক ধাপ অতিক্রম করেছে। বর্তমানে চাষের উন্নতির জন্য নানান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন হলেও, আদিমকালে তা সম্ভব ছিল না, তাদের কাছে ছিল বিশ্বাস আর সেই বিশ্বাস এর জন্যই তারা প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে ফসল কে বাঁচানোর জন্য, ভালো ফলনের আশায়, বৃষ্টির কামনায় নানান দেবদেবী, ব্রত—অনুষ্ঠানের আশ্রয় নিয়েছে। একবিংশ শতাব্দীতে পদার্পণ করেও অতীতের সেই বিশ্বাস কাল পরম্পরায় চলে আসছে। বহু শতাব্দী ধরে চলা বাংলার গাজন উৎসব অতীতের সেই কৃষিনির্ভর সমাজেরই সংস্কারজাত।

বাংলায় মূলত দুই ধরনের কৃষিভিত্তিক উৎসব হয়—১. কৃষি পূর্ববর্তী উৎসব, ২. কৃষি পরবর্তী উৎসব। গাজন হল প্রথম ধরনের। চৈত্রের সময় থেকে শুরু করে বর্ষার পূর্ব মুহুর্ত পর্যন্ত সূর্য যখন রুদ্রময় মূর্তি ধারণ করে, তখন সূর্যকে তুষ্ট করার জন্য ও উপযুক্ত বৃষ্টির আশায় কৃষকেরা গাজন উৎসবের প্রচলন করে। ব্রজমিত্র বলেছেন—"বাংলাদেশে দারুণ গ্রীষ্মের দহনে জল যখন শুকিয়ে, তৃণহীন দক্ষ প্রান্তর ধু ধু করে, তখনই হয় বাংলার গ্রামে গ্রামে গাজন।"[১] অর্থাৎ তপ্ত পৃথিবীকে সবুজে ভরিয়ে তোলবার উদ্দেশ্যেই চৈত্র শেষে বাঙালিরা গাজনে মেতে ওঠে।

গাজন হল শিব, ধর্মঠাকুর, মনসার পূজাকেন্দ্রিক উৎসব। শিব গাজন সাধারণত চৈত্র সংক্রান্তিতে হয়। আর ধর্মের গাজন পালিত হয় বৈশাখ পূর্ণিমাতে, তবে স্থান বিশেষে কোথাও কোথাও জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ী পূর্ণিমাতেও ধর্মের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। আবার কোথাও কোথাও বছরের যে কোনো সময়েই গাজন উৎসব পালন করা হয়, যাকে হুজুগে গাজন বলা হয়।

প্রাক আর্যযুগের সভ্যতা হরপ্পা-মহেঞ্জোদাড়োতে পদ্মাসনে উপবিষ্ট, ধ্যানমগ্ন, চক্ষু মুদ্রিত, তিনটি মাথা, তিনটি শিং এবং জীবজন্তু দ্বারা পরিবেষ্টিত এক দেবতার মূর্তি দেখা যায়, যাকে শিবের পূর্ব সংস্করণ বলে অনুমান করা হয়। আবার একটি

সিলমোহরে শিবের বাহন বৃষ এর মূর্তি খোদিত আছে। গবেষকেরা মনে করেন, শিব পূজার উৎপত্তি এখান থেকেই, সময়ের সাথে সাথে তা বিবর্তিত হয়ে এসেছে। পরবর্তীকালে এ দেশে আর্য প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, আর্যরা বহু অনার্য দেবতাদের ধীরে ধীরে আর্য দেবতায় পরিণত করেন। সেই আর্যীকরণের ফলে শিব পৌরাণিক দেবতা রূপে স্বীকৃত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমরা হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মন্তব্যের ওপর আলোকপাত করব, তিনি বলেছেন—"He is the God of the nomad flock-keeper and therefore, rides on the bull. He is a nomad of nomads the spirit of the nomadic horde."[২] বিভিন্ন পুরাণ, শাস্ত্র, ধর্মচর্যায় স্থান লাভ করলেও শিব যে আসলে লৌকিক দেবতা তা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তথ্যমূলক যুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আর সমগ্র অনুচ্চ হিন্দু সমাজও শিব কে নিজেদের দেবতা বলে মনে করে সূর্যের রুদ্রমূর্তি থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করতে মহাদিদেব শিবের স্মরণাপন্ন হয়ে শিবের গাজনে মেতে ওঠে। শিবের আর্যীকরণ ঘটলেও, অন্ত্যজ সম্প্রদায়- ডোম, হাড়ি, বাউরি, কোটালদের পূজিত ধর্ম ঠাকুরের আর্যীকরণ ঘটেনি। বর্তমানে কোথাও কোথাও ব্রাহ্মণেরা ধর্ম ঠাকুরের পূজা করলেও, রাঢ় বঙ্গের বহু জায়গায় ধর্ম ঠাকুর এখনও অন্ত্যজ শ্রেণি কর্তৃক পূজিত হয়। আর এই ধর্ম ঠাকুরের বাৎসরিক অনুষ্ঠানকে বলা হয় ধর্মের গাজন।

গাজন শব্দের উৎপত্তি নিয়ে প্রধানত দুটি মতামত প্রচলিত রয়েছে। এক মতে, গাজনে অংশগ্রহণকারী সন্ন্যাসী বা ভক্তরা একত্রিত হয়ে উচ্চস্বরে গর্জন করে শোভাযাত্রা করে। এই 'গর্জন' শব্দ থেকেই গাজন শব্দের উৎপত্তি। অপর মতে, 'গা' অর্থে গ্রাম এবং 'জন' অর্থে জনগণ অর্থাৎ গাজন হল গ্রামের খেটে খাওয়া জনগণের উৎসব। স্থান বিশেষে গাজন এক এক নামে পরিচিত। যেমন—মালদহের গম্ভীরা উৎসব, জলপাইগুড়িতে গমীরা। গাজন উৎসবের উৎপত্তি নিয়ে কথিত আছে, কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হয়ে শিবভক্ত বাণ রাজা অমরত্ব লাভের আশায় ভক্তিসূচক নৃত্যগীতাদি ও কৃচ্ছসাধনের মাধ্যমে শিবের পুজা সম্পন্ন করে অভীষ্ট সিদ্ধ করেন। বাণ রাজার এই ভক্তিকে স্মৃতিতে রেখে শিব বন্দনার উদ্দেশ্যে বহু শতাব্দী ধরে চলে আসছে শিবের গাজন এবং বাণ রাজার কৃচ্ছসাধনকে কেন্দ্র করে শিবের গাজনে বাণফোঁড়ার রেওয়াজ চলে আসছে।

গাজন উৎসবের মূলত তিনটি অংশ—সন্ন্যাস গ্রহণ, নীলব্রত ও চড়ক। ডোম, গোপ, কৈবর্ত প্রভৃতি সম্প্রদায় গাজনে মূল সন্ন্যাসীর ভার গ্রহণ করে। চৈত্র সংক্রান্তির দশ দিন পূর্বে তারা ক্ষৌরকর্ম দ্বারা পবিত্র হয়, তাদের ক্ষৌরকর্মের নাম 'দশের কামান'। তবে এখন কেউ কেউ চৈত্র সংক্রান্তির সাত দিন আগে কেউবা তিন দিন আগে ক্ষৌরকর্ম দ্বারা পবিত্র হয়ে সন্ন্যাস নিয়ম পালন করে। এই নিয়ম পালনে তারা শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মণের মতো পৈতে গ্রহণ করে। এই সন্ন্যাসীদের বলা হয় ভক্ত্যা। নিজস্ব গোত্র ত্যাগ করে গাজনের কয়েকদিন এরা শিবগোত্র ধারণ করে। প্রতিদলে একজন করে প্রধান ভক্ত্যা থাকে। তার নির্দেশে বাকি ভক্ত্যারা পরিবারের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করে গাজনের কয়েকদিন ব্রহ্মচর্য পালন করে থাকে এবং হর-পার্বতী, নন্দী, ভিঙ্গি সেজে বাণেশ্বর কাঁধে নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ভিক্ষে করে বেড়ায়। চৈত্র সংক্রান্তির আগের দিন হয় নীলপূজা। সমুদ্র মন্থনের সময় হলাহল বিষ পান করে দেবতাদের অমৃত এর সন্ধান দিয়েছিলেন। ঠিক তেমনি কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজে অনুর্বর হয়ে থাকা জমির বিষ খণ্ডন করে নতুন সৃষ্টিকে আগমন জানানোর জন্যই নীলপূজার সূচনা। এই পূজায় মায়েরা সন্তানদের মঙ্গল কামনায় নীলের উপোস করে।

গাজনের শেষ উৎসব হল চড়ক। চৈত্র সংক্রান্তির আগের দিন সন্ন্যাসীরা গ্রাম লাগোয়া নদী বা পুকুরের জলে নেমে চড়ক গাছকে তুলে নিয়ে আসে এবং পূজার দিন যথারীতি পূজার্চনা করে।

চড়কের মেলা প্রাঙ্গণে চড়ক গাছকে পুঁতে তার সঙ্গো একটি বাঁশ বেঁধে সেই বাঁশে ভক্ত্যাদের পিঠে লোহার বড়শি বিধিয়ে ঘোরানো হয়। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে বিডন সাহেব আইন করে এ নিয়ম বন্ধ করে দিলেও এখনও কোথাও কোথাও এ নিয়ম প্রচলিত আছে। এছাড়া শরীরের বিভিন্ন অংশে বাণফোঁড়া, জ্বলন্ত কয়লায় হাঁটা প্রভৃতি দুঃসাহসিক পীড়নমূলক ক্রিয়াকলাপ এ উৎসবে ভক্তরা করে থাকে।

প্রায় সমগ্র বাংলায় ছোটো বড়ো গাজন উৎসব পালিত হলেও উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু স্থানের পাশাপাশি বিস্তীর্ণ রাঢ় অঞ্চলে এটি মহোৎসবে পরিণত হয়েছে। উৎসবের মূল কাঠামো সর্বত্র প্রায় একই থাকলেও অঞ্চলভেদে এর কিছু নিজস্ব বিশেষত্ব রয়েছে। নিম্নে অঞ্চলভেদে সেই বিশেষত্ব গুলি ক্ষুদ্র পরিসরে আলোচনা করা হল—

● **মালদহ:** চৈত্র সংক্রান্তির গাজন উৎসব মালদহে 'গম্ভীরা' নামে পরিচিত। ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন—"উৎসবটি এখন শিবের সঙ্গো সম্পর্কযুক্ত কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই অঞ্চলে শৈব ধর্ম প্রসারের পূর্বেও এই উৎসব এই অঞ্চলে প্রচলিত ছিল, তখন তা সূর্যোৎসব বলে পরিচিত ছিল।"[৩] পূর্বের সেই সূর্যোৎসব বর্তমানে আদ্যের গম্ভীরা বা শিবের গম্ভীরা নামে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। গম্ভীরা শব্দের তাৎপর্য বিশ্লেষণে ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য[৪] গামার কাঠ দিয়ে তৈরি সূর্য ঠাকুরের মন্দিরের কথা বলেছেন। এই গামার শব্দটি পরবর্তীকালে হিন্দু প্রভাবের ফলে গম্ভীরা নামে খ্যাত হয়।

গম্ভীরা উৎসবের নাচ, গান সবেরই মধ্যে দিয়ে শিবকে আরাধনা করা হয়। মূলত চার দিন ধরে চলে গম্ভীরা উৎসব। প্রথম দিন ঘট ভরা' অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পূজার সূচনা হয়। এরপর অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ে এক এক দিন ছোটো তামাসা, বড়ো তামাসা, আহারা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। শেষ দিন বিভিন্ন দেবদেবীর ছদ্মবেশে ভক্ত্যারা পাড়ায় পাড়ায় নৃত্য করে বেড়ায় এবং চড়ক পূজার মধ্যে দিয়ে গম্ভীরা উৎসব শেষ হয়।

গম্ভীরা উৎসবের প্রাণ হল গম্ভীরা গান। শিব-চরিত্রের নানান ঘটনার পাশাপাশি মানুষের দৈনন্দিন জীবন সমস্যা, সামাজিক নানান ঘটনা প্রবাহ, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, দুর্নীতির প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে গম্ভীরার গানে। শিল্পীরা দেবদেবীকে সম্মোধন করে নিজেদের সারা বছরের সুখ-দুঃখের কথা গানের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তোলে যা আদ্যের গম্ভীরা নামে পরিচিত। যেমন— শিবকে সম্মোধন করে তারা নানান দৈনন্দিন সমস্যা তুলে ধরে গায়—

> কি করলি হে দশা দৈন্য/দেশের লোক পায় না অন্ন/হায় কি রে পস্তানার কথা/শায়েস্তা খাঁর আমলে শিব হে।/তখন গরীব দুঃখী আছিল সুখি/টাকায় আটমণের ভাত চাপ হে/কুষ্ঠে (কোথায়) গেল সে সুখের দিন/হনু দিনে দিনে দীনের অধীন শিব হে।[৫]

দেবদেবীকে সম্মোধনের পাশাপাশি শিল্পীরা নানা-নাতি সেজে সামাজিক সমস্যা, সমসাময়িক রাজনৈতিক সমস্যার কথা তুলে ধরে যা পালা গম্ভীরা নামে পরিচিত। বর্তমানে গম্ভীরার জৌলুস অনেকটাই কমে গেছে, তবুও মালদহের ইংরেজবাজার, ফুলবাড়ি, জোহারিতলা প্রভৃতি স্থানে আজও শিব ভক্তগণ গম্ভীরার কয়েকদিন মহোৎসবে সামিল হয়।

● **বাঁকুড়া :** রাঢ় বঙ্গের অন্তর্গত বাঁকুড়া জেলার এক্তেশ্বরের গাজন বাঁকুড়ার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মেলা। দ্বারকেশ্বর নদের তীরে অবস্থিত এক্তেশ্বরের শিব মন্দিরটি প্রায় হাজার বছরের পুরোনো। মাকড়া পাথরের তৈরী প্রায় পয়তাল্লিশ ফুট উঁচু এই মন্দিরে ল্যাটেরাইট পাথরের তৈরী শিবের পদমূর্তি পূজিত হয়, যা বাংলার স্থাপত্যের এক অন্যতম নির্দশন। জনশ্রুত অনুসারে,

একসময় বিষ্ণুপুর ও সামন্তভুম রাজ্যের মধ্যে সীমানা নিয়ে বিবাদ তৈরী হয়। তা নিস্পত্তি করার জন্য স্বয়ং শিব তখন ধ্যানে বসেছিলেন। তিনি তখন এক্তেশ্বরের মূর্তিতে দুই রাজ্যের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে দন্ডায়মান হন।[৬] এই লোককথা অনুসারে বহুবছর ধরে এক্তেশ্বর শিব মন্দিরে ধুমধাম করে শিবের গাজন পালন করা হয়। চৈত্র সংক্রান্তির আগের রাত থেকে সংক্রান্তির সকাল পর্যন্ত এখানে গাজন উৎসব চলে। ঐতিহ্যবাহী মন্দির হওয়ার কারনে এখানে এই সময় প্রচুর পূর্ন্যার্থীর ভিড় জমে। একসময় এখানে গাজনের দিন রাত্রে জ্বলন্ত চিতার মতো আগুন জ্বালিয়ে ভক্তারা 'সতীদাহ উৎসব' পালন করত। বর্তমানে তা বন্ধ হয়ে গেছে। মনস্কামনা পূরণের জন্য বহু পুণ্যার্থী আগেকার মত আজও মন্দির চত্বরে দন্ডি কাটে।

এক্তেশ্বরের পাশাপাশি বাঁকুড়ার বাহুলাডার সিদ্ধেশ্বর শিবের মন্দিরে চৈত্র সংক্রান্তিতে ধূমধাম করে শিবের গাজন পালন করা হয়। দ্বারকেশ্বর নদের তীরে সুউচ্চ সিদ্ধেশ্বর মন্দিরে শিবলিঙ্গের পাশাপাশি গনেশ, জৈন পার্শনাথ ও মহিষমর্দিনীরও মূর্তি রয়েছে। কয়েকশত বছরের পুরোনো এখানকার গাজন মেলায় পূর্বে পিঠে বাণফোঁড়া হতো, যদিও অনেকদিন ধরে সেই প্রথা বন্ধ হয়ে গেছে। তবে বর্তমানে পিঠে বাণফোঁড়া না হলেও জ্বলন্ত অঙ্গারে হাঁটা কিংবা শরীরের অন্যান্য জায়গায় বাণফোঁড়া সেই পূর্বের মতোই হয়।

বাঁকুড়ার পাঁচালের গাজন বিখ্যাত হয়ে আছে ভক্ত্যাদের বাণফোঁড়া অনুষ্ঠানের জন্য, খয়রা, নায়েক, বাউরি প্রভৃতি নিম্নবর্ণের মানুষ পাঁচালের গাজনে অংশগ্রহন করে। সারাবছর ব্রাহ্মণ এখানে শিবের পূজা করলেও গাজনের দিন নিম্নবর্ণের ভক্ত্যারা পূজা করে থাকে। নিজের শরীরে দৈহিক পীড়নের দ্বারা তারা শিবের বন্দনা করে। বিনয় ঘোষ তাঁর 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে এখানকার বাণফোঁড়া অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত 'চৌরঙ্গিবাণ' ও নলিবাণ এর কথা বলেছেন।[৭]

বাঁকুড়া জেলার বেলিয়াতোড়া ধর্ম রাজের গাজন উৎসব বিখ্যাত। আষাঢ়ী পূর্ণিমায় ডোম, বাউরি প্রভৃতি নিম্নবর্ণের লোকেরা এখানে ধর্মরাজের গাজন উৎসব পালন করে। গাজনের সময় তারা ধর্মঠাকুর, স্বরূপ নারায়ণ ও মাদান দেবতাকে বড়ো বড়ো তিনটি ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে শোভাযাত্রায় বের হয়। যা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পূর্বে এখানে ধর্মঠাকুর অনুচ্চদের হাতে পূজিত হলেও বর্তমানে ব্রাহ্মণরাই পূজা করে। এছাড়া বাঁকুড়া জেলার গাঁড়রা, খামারবেড়, মশিয়ারা গ্রামের শিবের গাজন, মেট্যালী গ্রামের বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন অনুষ্ঠিত ধর্মরাজের গাজন বিখ্যাত।

● **বর্ধমান :** বর্ধমানের কুড়মুন গ্রামের ঈশানেশ্বর শিবের বিখ্যাত শিবের গাজন উৎসব প্রায় আড়াইশো বছরের প্রাচীন। কিংবদন্তী হল, 'মন্ডল' উপাধিকারী উগ্রক্ষত্রিয়দের পূর্বপুরুষ সন্তোষ মন্ডল স্বপ্নাদেশে খড়িনদীর কলমিসায়রের দহ থেকে ঈশানেশ্বর শিবকে নিয়ে এসে গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেন।[৮] সেই থেকে সন্তোষ মন্ডলের বংশধররাই বংশপরম্পরায় ঈশানেশ্বরের গাজন উৎসব পরিচালনা করেন। কুড়মুনে 'কালাচাঁদ' নামক ধর্মঠাকুর থাকলেও ঈশান্বেশ্বর শিবের প্রভাবে কালাচাঁদ ধর্মঠাকুরের উৎসব এর জৌলুস বর্তমানে অনেকটাই কমে গেছে। একসময় 'মন্ডল' উপাধিধারী উগ্রক্ষত্রিয়রা পূজা চালনা করলেও বর্তমানে ব্রাহ্মণরা পূজার কর্তৃত্ব অনেকটাই গ্রহন করে নিয়েছে, এই গাজন উৎসব উপলক্ষ্যে এখানে 'খেস্যা' গান এর লড়াই হয়। যদিও পূর্বের মতো সেইরকম জৌলুস আর নেই এই গানের। কুড়মুন গ্রামের গাজনে নরমুন্ড নিয়ে নৃত্য করে থাকে শ্মশান সন্ন্যাসীরা। এছাড়া এখানে গাজন উৎসব উপলক্ষ্যে বসা মেলায় পৌরাণিক দেবদেবীদের নিয়ে তৈরি মাটির মূর্তি প্রদর্শিত হয়, যাতে রয়েছে এখানকার লোকশিল্পের ছোঁয়া। শুধুমাত্র শিব নয়, কুড়মুন গ্রামে অতি প্রাচীন কাল থেকে ধর্মঠাকুরেরও উপাসনা করা হয়। গ্রামের মাঝামাঝি একটি

বট গাছের তলায় মাটির মরে কালাচাঁদ নামক এক ধর্মরাজ অধিষ্ঠিত রয়েছেন। প্রতি বৈশাখী পূর্ণিমায় চার-পাঁচদিন ধরে এই কালাচাঁদ ধর্মঠাকুরের গাজন কঠোর নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে উদ্‌যাপন হয়ে থাকে। তবে ঈশানেশ্বর শিবের গাজনের ফলে বর্তমানে কালাচাঁদের গাজন অনেকটাই জৌলুসহীন হয়ে গেছে। কালাচাঁদের পাশাপাশি এই গ্রামের সুফল দুলের বাড়িতে আরও একটি ধর্মরাজ অধিষ্ঠিত হয়েছে। জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা বা আষাঢ়ী পূর্ণিমায় এই ধর্মরাজের পূজা করা হয়। বংশ পরম্পরায় দুলেরাই এই পূজা করে এসেছে। চার-পাঁচদিন ধরে চলা এই গাজন উৎসবে পাঁঠাবলি হয়। বৈশাখ মাসে বুদ্ধ পূর্ণিমায় বর্ধমানের জামালপুরে বুড়োরাজার গাজন উপলক্ষ্যে এক বিরাট মেলা বসে, যা বর্ধমানের অন্যতম মেলা হিসেবে স্বীকৃত। অনুষদের ধর্মরাজা ও ব্রাহ্মণদের শিবের সংমিশ্রনে এই উৎসব পালিত হয়। 'বুড়োশিব' এর বুড়ো এবং 'ধর্মরাজ' এর রাজ এই দুয়ে মিলে দেবতার নাম হয়েছে বুড়োরাজা। বুদ্ধ পূর্ণিমার সাতদিন আগে থেকে এখানে নানা অঞ্চলের লোক এসে সন্ন্যাস গ্রহণ করে। মনস্কামনা পূরণের জন্য এই সময় গ্রামারের বহু মানুষ এসে বুড়োরাজার চরণে ধরা দেয়। শিব ও ধর্মরাজের একসঙ্গে আরাধনা হলেও নৈবেদ্যের সময় খানায় কাটি দিয়ে দাগ টেনে শিব ও ধর্মরাজের সূক্ষ্ম পার্থক্য বোঝানো হয়।

পূর্ব বর্ধমানের গঙ্গাটিকুরি গ্রামটি গাজনের 'জল সন্ন্যাস' এই বিশেষ দিনের জন্যই বিখ্যাত। চৈত্র মাসের শেষ চারদিন এখানে শিব গাজনকে কেন্দ্র করে ফুল ভাঙা, জল সন্ন্যাস, নীলব্রত চড়ক অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। প্রথম দিন সন্ন্যাসীরা গ্রামে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন গাছের ডাল ভেঙ্গে শিবের কাছে উৎসর্গ করে। পরেরদিন শিবকে দোলায় নিয়ে যায়। স্নান সেরে করে সন্ন্যসীরা উপোস ভাসে। এই জল সন্ন্যাস দিনে হাজার হাজার মানুষ সন্ন্যাসীদের সঙ্গে স্নান যাত্রা করে। কেবল আশেপাশের অঞ্চলের মানুষই নয়, দূর-দূরান্ত থেকে অনেক সাধারণ মানুষও এই সময় এখানে ভিড় করে যা এখানকার গাজনের এক অন্যতম বিশেষজ্ঞ। চড়কের দিনেও এখানে শিবকে দোলায় করে গ্রামে গ্রামে শোভাযাত্রা করা হয়। এছাড়া ভাতার থানার অন্তর্গত রায়রামচন্দ্রপুরে "পোড়া রায় ও ময়না রায়" নামক ধর্মরাজের গাজন, মানকর গ্রামের ধর্মরাজের গাজন কাঠোয়ার সিঙ্গি গ্রামের শিবের গাজন প্রভৃতি উপলক্ষ্যে প্রতিবছর বহু মানুষের ভিড় জমে।

● **বীরভূম :** বীরভূমের বল্লভপুর ডাঙার গ্রামীণ শিবের গাজন খুব প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী না হলেও আশেপাশের গ্রামের উৎসাহী জনতার ভিড় টারে সক্ষম। এখানকার গাজনের বিশেষত্ব হল চড়ক। শিবসংক্রান্তির রাত থেকে এখানে চড়ক মেলা বসে। পয়লা বৈশাখ চড়ক পূজা হয়। চড়ক গাছের কাছে দুটি ঘর তৈরি করা হয়, যার বারান্দার দুজন মহিলা মাথায় মঙ্গল ঘট নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। রাঢ় বঙ্গের অন্যান্য স্থানের মতো এখানেও অনুচরা সন্ন্যাস গ্রহন করে। চড়কের দিন এখানে মানত করা পাঁঠা বলি হয় এবং যদি হওয়া পাঁঠার মাথা শিবকে উৎসর্গ করা হয়।

শিব গাজনের তুলনায় বীরভূমে ধর্মঠাকুরের গাজন সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। মূলত ডোম, বাউরি এরাই এই পূজার সন্নাসীর ভার গ্রহন করে, এদেরকে এখানে বলা হয় 'দেয়াসী'। সন্ন্যাসীরা ধর্মঠাকুরকে নিয়ে সংযাত্রায় বের হয়, এই সময় তারা গ্রামে গ্রামে ঘুরে বীরভূম জেলার বিশেষত্ব 'বোলান গান' গেয়ে থাকে। নানান পৌরাণিক ঘটনার পাশাপাশি সামাজিক সমস্যাও ফুটে ওঠে সেই গানে—

> ঊর্ধমুখে গাভীগণে, ভাই, হাম্বা হাম্বা রবে।/অঙ্গনে দাঁড়ায়ে ডাকে কোথায় প্রাণ কেশবে।।/তাদের চক্ষে ধারা বয় রে।/এ দুঃখ কি প্রাণে সয় রে।।[৯]

বীরভূমের মেটেলা গ্রামে বুদ্ধ পূর্ণিমায় ধর্মরাজ ঠাকুরের পূজা উপলক্ষ্যে গাজন অনুষ্ঠিত হয়।

শতাব্দী প্রাচীন এই গাজনকে ঘিরে বহু মানুষের আগমন ঘটে, যারা ধর্মঠাকুরকে নিয়ে বের হওয়া শোভাযাত্রায় ও অংশগ্রহণ করে। চড়ক মেলায় অনুষ্ঠিত হওয়া বাণফোঁড়া এখানকার গাজনের এক অন্যতম আকর্ষণ। বাঙালির 'বারো মাসে তেরো পার্বণ' এর আজ অনেক পার্বণই অবক্ষয়ের পথে। গতিশীল শহুরে সংস্কৃতি দ্বারা গ্রামীণ সংস্কৃতিকে ধীরে ধীরে গ্রাস করার মধ্য দিয়ে সেই অবক্ষয়ের সূচনা। এক সময় সূর্য বন্দনাকে কেন্দ্র করে যে গাজন উৎসব শুরু হয়েছিল, সেখানে সামাজিক কৌলিন্যকে ভেঙে বহু মানুষ একত্রিত হতো তা আজ অনেকটাই স্তিমিত হয়ে গেছে। বর্ষের শেষ প্রহরে সূর্যের তপ্ত মূর্তিকে শান্ত করার জন্য সূর্য বন্দনা অপেক্ষা ঠান্ডা ঘরে থাকতেই নাগরিক ভোগবাদী জীবন বেশি সাচ্ছন্দ্য বোধ করে। গ্রামীন সংস্কৃতির পূর্বের সেই সারল্য, উদারতা কোথাও না কোথাও নাগরিক সাচ্ছন্দ্যের কবলে এসে পড়েছে। ফলে বহু শতাব্দী ধরে চলে আসা নানান গ্রামীন ঐতিহ্য কোথাও পরিবর্তিত হয়েছে, কোথাও বা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়েছে। এই অবক্ষয়ের যুগে বাংলার গাজন উৎসব তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখলেও পূর্বের জৌলুস হারিয়েছে। গাজনে অনুষ্ঠিত হওয়া নানা অবৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপের উপর যেমন প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ পড়েছে তেমনি অঞ্চলভেদে গাজনে ব্যবহৃত খেস্যা গান, বোলান গান প্রভৃতি লোকসংগীত শিক্ষিত মানুষজনের কাছে অশ্লীলতার দোষে দুষ্ট। তবে বিজ্ঞানমনস্ক আধুনিকতা গাজন উৎসবকে যতই গ্রাস করুক না কেন, গ্রাম-বাংলার অন্ত্যজ শ্রেণিরা আজও নাগরিক ভোগবিলাসের ফাঁদে পা না বাড়িয়ে গ্রীষ্মের তপ্ত দুপুরে অনাবিল আনন্দের সঙ্গো গাজন উৎসবে মেতে ওঠে।

উৎসের সন্ধানে

১. হীরেন্দ্রনাথ মিত্র (বজ্রমিত্র) : 'বাংলার লোক-উৎসব ও লোকশিল্প', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, চৈত্র ১৪১৫, পৃ. ১০

২. Haraprasad Shastri : Lokoyata & Vratya, Haraprasad Gavesona Kendra, Naihati 1982, P. 58

৩. মাযহারুল ইসলাম তরু সম্পাদিত : 'গম্ভীরা কত প্রাচীন' (ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য), হাজার বছরের গম্ভীরা, প্রতিভাস, ২৩ এপ্রিল ১৯৯৮, পৃ. ১৫৮)

৪. তদেব, পৃ. ১৫-১৬

৫. মাযহারুল ইসলাম তরু সম্পাদিত : 'হাজার বছরের গম্ভীরা', প্রদ্যোত ঘোষ লিখিত "গম্ভীরা গান", প্রতিভাস, ২৩ এপ্রিল ১৯৯৮, পৃ. ৪৩

৬. বিনয় ঘোষ : 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' প্রথম খণ্ড, প্রকাশ ভবন, ১৯৭৬, পৃ. ৩৬৭

৭. তদেব, পৃ. ৪০০-৪০১

৮. তদেব, পৃ. ২৩২

৯. শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলা লোক-সাহিত্য' ৩য় খণ্ড, কালকাটা বুক হাউস, ১৯৫৪, পৃ. ৪৯৪

তথ্যের সন্ধানে

১. শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলা লোক-সাহিত্য', কালকাটা বুক হাউস, ১৯৫৪

২. দুলাল চৌধুরী : 'বাংলার লোকউৎসব', পুস্তক বিপণি, ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬

৩. বিনয় ঘোষ : 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' প্রথম খণ্ড, প্রকাশ ভবন, ১৯৭৬

৪. মাযহারুল ইসলাম তরু সম্পাদিত : 'হাজার বছরের গম্ভীরা', প্রতিভাস, ২৩ এপ্রিল ১৯৯৮

৫. দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় : 'পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় মেলায় মেলায়', সুদর্শন প্রকাশন, ডিসেম্বর ২০১৪